আকাশকুসুমের অধিকার

মিহির চক্রবর্তী

গণিতশিল্পী ছাড়া 'আকাশকুসুম' এর চাষ-আবাদ করার ক্ষমতা ও দুঃসাহস বিজ্ঞান জগতের আর কোন্ সাধকের থাকতে পারে ? বিজ্ঞানের বাইরে (সত্যিই বাইরে কি ?) হয়তো আছে কবির, হয়তো শিল্পীর।

অন্যদের 'বিষয়' নিতান্তই বাস্তব। পদার্থবিদের জড়পদার্থ, তার মধ্যেকার অণু-পরমাণু, তাদের গতিময়তা ও টানাপোড়েন, বটানিস্টের উদ্ভিদ, তার বৈচিত্র্য, তার জন্ম-মৃত্যু, জীববিজ্ঞানীর জীবজগত, তাদের ভালোবাসা তাদের বাঁচার নিয়মাবলী। বিষয় জ্ঞাতার বাইরে, তার অস্তিত্ব জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ এবং প্রচেষ্টা থাকে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান অনুসন্ধানের। এ জ্ঞানের রূপ বাক্যবিন্যাসে, যে বাক্য উচ্চারিত হবার আগেই সত্য অথবা মিথ্যা হয়ে আছে। কোনো একসময় ভাষা ছিল না তবু বিষয় ছিল। তারপর এক মহালগনে আমরা প্রথম উচ্চারণ করতে জানলাম— 'সূর্য', 'পৃথিবী', 'আবর্তন'। প্রথম প্রকৃতি-পাঠক বললেন 'সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হয়'। মিথ্যে হয়েই জন্ম নিল বাক্যটি।

(আজকাল অনেকেই এসবে সন্দিহান, জানি তবু তা এখনো সন্দেহই। ভাবনার মূল কাঠামোয় তেমন কোনো বদল ঘটেছে বলে মনে হয় না।)

বিপরীতে গণিতসাধকের জ্ঞেয় বিষয় তাঁর মনের মধ্যেই, তাঁর কল্পনায়। একটি কাগজে, রুলার দিয়ে একটি রেখা আঁকা হল। গণিতবিদ তার বাইরের অবস্থিত এই বস্তু রূপটিকে অন্য সকলের মতো দেখেন। কিন্তু এটিই তাঁর বিষয় নয়। তাঁর কল্পনায় এবারে রেখাটির বাস্তব প্রস্থকে মুছে ফেলতে ফেলতে তাকে একেবারে সীমায় ঠেলে নিয়ে যান। আবার অন্যদিকে রেখাটিকে দুদিকেই প্রসারিত করতে থাকেন যে কোনো সীমানা অতিক্রম করে। কল্পনার এই খেলায় কাগজের উপরকার বাস্তব, সীমায়িত প্রস্থবান রেখাটি একটি অন্য রূপ পেয়ে যায় — এরূপ আর বাইরে নেই, সমস্তটাই গণিতশিল্পীর মনে। নতুন এই রহস্যময়, মায়াবী রূপটিকে এবারে তিনি বরণ করে নেন তার 'বিষয়' হিসাবে এবং যথেষ্ট বিস্ময়ে তাকে, সেই বিষয়কে, পর্যবেক্ষণ করেন। বিষয়টিকে তার রহস্যাবৃত মনে হয়। এবং এই রহস্যের উন্মোচন তার কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এভাবেই গড়ে ওঠে একটি নতুন রূপ, যা বস্তুত গণিত স্রষ্টার মনেরই সৃষ্টি, যার কাছে স্রষ্টা নিজেই নতজানু, যেভাবে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী নতজানু প্রকৃতির কাছে।
প্রকৃতিবিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রকৃতির একটি খেলা চলে। বিজ্ঞানী এই খেলায় একজন বুদ্ধিমান কল্পনাক্ষম প্রার্থী— প্রার্থী তার বিষয় প্রকৃতির কাছে। গণিতবিদও এই ধরনের এক খেলাতেই লিপ্ত হন। তবে তার খেলার সামগ্রী তিনি নিজেই গড়ে নেন।
(বিতর্ক : এ সামগ্রী কতটা স্রষ্টা-নির্ভর? বাস্তব রেখাটি থেকে উদ্ভূত এই যে নতুন রূপ, এর মধ্যে একটি ইউনিভার্সালিটি থাকে। সকল সুস্থ কল্পনাশীল মানুষই মনের এই কারিগরিতে পারদর্শী, সকলেই সেই আইডিয়াল রেখা রূপটি মনের আঁশিতে দেখতে সক্ষম।
প্লেটো বলবেন অন্যভাবে। তিনি বলবেন, এই রূপটিই বাস্তব। The so called real world of experience is not at all real. We are like dwellers in a cave, who perceive the shadows of the external world and mistake the shadow for the real thing.)

তখনই অপরিহার্য হয়ে পড়ে কথা। অন্য বিজ্ঞানী তার বিষয় দেখিয়ে দিতে পারেন, যেমন— এই একটি বৃক্ষ, অথবা এই একটি প্রাণী, অথবা এই একটুকরো উল্কাপিণ্ড, অথবা এমনকি, এই একটি ইলেকট্রন। বিষয় উপস্থাপনার জন্য কথা তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। কথার ভূমিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিষয়-এর জ্ঞানের বাহক হিসাবে।

কিন্তু গণিতের বিষয় মানেই একটি বা কয়েকটি গুণের বর্ণনা— বিন্দু : যার অবস্থান আছে অথচ পরিমাণ নেই। সংখ্যা : কোনো বস্তুসমষ্টির সেই ধর্ম যা পড়ে থাকেই বস্তুগুলি থেকে তাদের সমস্ত বিশেষ গুণাবলী যেমন, রঙ, আকার, গন্ধ, বা এমনি সব কিছু, সরিয়ে নিলেও।

কথার মতো শক্তিমান অ-বাস্তব আর কী আছে? কয়েকটি ধ্বনি দিয়ে অথবা চিহ্ন দিয়ে পর পর সাজিয়ে তোলা একটি পরম্পরা, একান্তই অ্যাবস্ট্রাকট গঠন একটি, কী মায়ার খেলায় জড়িয়ে ফেলেছে মানুষকে। ধ্বনির গঠন আবার তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়ের অস্তিত্বের পরেই তার বর্ণনা আসে। এখানে বর্ণনা দিয়েই বিষয়ের সৃষ্টি।
(তুলনা। বিষয় :— মৎস্যকন্যা : মাছের শরীর, মানুষীর মুখ, জলে ভেসে বেড়ায়।)
বাইরে নেই। মনে আছে। ভালবাসায় আছে।
রবীন্দ্রনাথের 'সে' মনে পড়ে? 'পুপে দিদিমনিকে ধারা বেয়ে যে গল্প বলে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন একটি সর্বনামধারী, সে কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরী।'
এই অ্যাবস্ট্রাকশন এবং বাণী-নির্ভরতার ফলে axiomatization হয়ে পড়ে গণিতের গঠনপ্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

কয়েকটি বাক্য উপস্থিত করা হয় খেলার টেবিলে। ধরে নেওয়া হয় কিছু সামগ্রী আছে যারা ঐ বাক্য উল্লেখিত গুণাবলীর আধার। ভালো হয় ইতিপূর্বে গঠিত কিছু গণিত সামগ্রীর যদি ঐ গুণাবলী থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, গণিতের ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি axiom-গুলির জন্য আদিম সামগ্রীগুলির অস্তিত্ব প্রামাণ্য নয়। খানিকটা বোধ বা কাণ্ডজ্ঞানের ওপর ছেড়ে দিতে হয় এদের অস্তিত্বকে।
যেমন ইউক্লিডিয় জ্যামিতির axiom-গুলি অথবা পিয়ানোর সংখ্যাসংক্রান্ত axiom-গুলি। প্রথম গুচ্ছকে ধারণ করার জন্য আছে বিন্দু, সরলরেখা ইত্যাদি জ্যামিতির অবাস্তব বস্তুগুলি। আর দ্বিতীয় গুচ্ছের জন্য বিমূর্ত পূর্ণ সংখ্যার দল।

এইভাবেই বাস্তব বস্তু থেকে কল্পনায় এবং তার পরে সে কল্পনার বাণীরূপ। অথবা বাস্তব বস্তুর আভাস থেকে কথা এবং কথা থেকে কল্পনায় এক রূপের অবয়ব গড়ে তোলা।

ঠিক এখানেই সেই পুরনো প্রশ্নটি এসে যায়। কথা ছাড়া মানুষ কি ভাবতে পারে? বাণীহীন অর্থাৎ ভাষা গড়ে ওঠেনি যাদের তারা কি কল্পনা করতে পারে? ভাবতে পারে? অন্তত স্ট্রাকচারড বিমূর্ত ভাবনা? গণিতের মতো ভাবনা?

প্রাথমিক গঠনের পরে যে অ্যাবস্ট্রাকট রূপটি তৈরি হল তার কিছু নির্দিষ্ট গুণ আছে। এই অবাস্তব বস্তুগুলির সত্য কাহিনী রয়েছে।

সে গুণাবলীর 'আবিষ্কার'ই গণিতকর্মীর কাজ। এবং তার পদ্ধতি হল গাণিতিক প্রমাণের মধ্য দিয়ে যাওয়া। প্রমাণপদ্ধতি মাত্রেই অ্যাবস্ট্রাকট। সূর্যের আকৃতি গোলাকার— এর প্রমাণ সরাসরি, প্রকৃত তথ্য খোঁজার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ত্রিভুজের কোণের সমদ্বিখণ্ডক তিনটি একই বিন্দু দিয়ে যায়— একথার প্রমাণ যুক্তি-তর্ক দিয়ে করতে হয়। এই বিমূর্ত কথা চালাচালির মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্ত আসে তা এত অমোঘ, এত সন্দেহাতীত মনে হয় কেন— এটা এক বিস্ময়।

ফলত গণিত জগতের বিচরণকারীর কাজ দ্বিবিধ :

শিল্পী হিসাবে— আশ্চর্য, অসম্ভব, সুন্দর রূপের নির্মাণ।

আবিষ্কারক হিসাবে— সেই নির্মিত রূপের অজ্ঞাত গুণাবলীর অনুসন্ধান।

অজ্ঞাত গুণাবলীর আবিষ্কারের পদ্ধতিটি আরো একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। Axiom-গুলি দিয়ে রূপ নির্মাণের পরে নির্মাতার দায়িত্ব মূলত শেষ যদিও রূপের মূল একক-গুলি সাজিয়ে অন্যান্য বিচিত্র মিশ্র রূপ সৃষ্টির কাজেও শিল্পীসত্তাই ক্রিয়াশীল।

এরপরে আবিষ্কারক হিসাবে গণিতকর্মীর কাজের শুরু। তিনি তখন একের পরে এক গুণনির্দেশক বাক্য (কথার মাহাত্ম্য আবার লক্ষণীয়) উপস্থাপিত করেন এবং প্রশ্ন করেন, এ কি সত্যি না মিথ্যে? সত্যি, মিথ্যে শব্দ দুটো বহির্বিশ্বের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য হয়। গণিতের ক্ষেত্রে বরং বলা ভালো বাক্যটি প্রামাণ্য না অ-প্রামাণ্য। এতদিনের বিশ্বাস ছিল একটি অথবা অন্যটি হতে বাধ্য। সম্প্রতি তিরিশের দশকের পর থেকে একটি তৃতীয় সম্ভাবনাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন গণিত-পথিকেরা— তা হল প্রামাণ্য বা অ-প্রামাণ্য কোনোটিই নয়। অনিশ্চিতির আরো একটি কারণ, গাণিতিক প্রমাণপদ্ধতিতেও বিভিন্নতার উপস্থিতি। একই গাণিতিক রূপ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন গুণসত্তার সন্ধান দিতে পারে, এমনকি বিরোধী সত্তারও।

গাণিতিক প্রমাণ এক জাতীয় পদ্ধতি, বিগত এক শতকেরও বেশি সময় ধরে যার গ্রহণ-যোগ্যতা এবং মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও, পদার্থবিদ্যায় তো বটেই—এই পদ্ধতির প্রয়োগ এক লাফে সম্মান বাড়িয়ে তোলে। 'Understanding means understanding through mathematics,' গণিতের অপর নাম র‍্যাশানালিটির অপর নাম গণিত। সকলেই জানেন অধিকাংশ গণিতজ্ঞের আচরণ অস্বাভাবিক, তবুও।

ফলে 'বিজ্ঞানের রানী' থেকে যে কোনো অন্য জ্ঞানের 'পরিচারিকা'য় পরিণতিলাভ।

Non-standard analysis-কে অধ্যাপক William F. Taylor কী চোখে দেখেন

তার নমুনা : That subject looks very interesting to me, and I wish I could take out the time to master it. There are numerous places in my field where one is confronted with things that are going on simultaneously at totally different size scales. They are very difficult to deal with by conventional methods. Perhaps non-standard analysis with its infinitesimals might provide a handle for this sort of things.

টেলর ইনজিয়ারিং বিজ্ঞানের একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব।

কোনো আশ্চর্য সুন্দর গণিতাংশকে প্রায়ই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়— 'কী হবে এ দিয়ে ?'

প্রশ্ন হয় না : 'কেমন লাগছে একে ?'

কেন ? কেন গণিতের অন্য নাম র‍্যাশনালিটি ? 'Quantitative science— that is Science with mathematics— has proved successful in controlling nature. The majority of the Society backs it up for this reason. At the present moment, they want nature to be altered and controlled— to the extent, of course, that we can do it and the results are felicitous. The humanist point of view is a minority point of view. But it is influential— one sees this among young people'— ১৯৭৭-এর আগস্ট মাসে অধ্যাপক টেলরের এই সাক্ষাৎকার। আমি আরো লক্ষ করতে বলি ঐ 'humanist point of view' শব্দগুচ্ছকে।

কে কথা বলছে ? ক্ষমতা। মেজরিটি প্রকৃতপক্ষে— ক্ষমতাবান গোষ্ঠী, অথবা মেজরিটির অর্থ গতানুগতিকতা।

সমস্ত জ্ঞানের পদ্ধতির চূড়ান্ত শুদ্ধ রূপ গাণিতিক পদ্ধতি— এই বোধ ও বিশ্বাসে একটু ভাঙন ধরেছে ইদানিং। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে, আমার মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্যতর হল, প্রচলিত গণিতের ভিত্তি ও পদ্ধতিতে গণিতের অন্তর্জগত থেকেই উদ্ভূত সন্দেহ। এই সন্দেহের মুখে দাঁড়িয়ে গণিত এতদিনকার অদ্বৈততা হারিয়ে ফেলছে। সে শতধারায় বিভক্ত— আমি বলতে চাই বিকশিত। বিকল্প গণিতেরা দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মূল স্রোতটি অবশ্যই অদ্বৈততার রক্ষক, কারণ স্পষ্টতই পায়ের তলার ভূমি। আর বিভিন্ন ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, বিদ্রোহী, অর্বাচীন ধারণাগুলির ক্রমাগত আবির্ভাব। কে বাঁচে কে হারায় সে প্রশ্ন এই ক্ষণে অর্থহীন। ধারাগুলি যেন স্বাভাবিক পরিণতি পেতে পারে— সভ্যতার দায় এটুকুই। তাকে যেন

স্বাভাবিক জল-হাওয়া থেকে বঞ্চিত না করা হয়। এ দায়িত্ব পালন করছে কই সভ্যতা? আর এই যে আত্মপ্রকাশনার সুযোগ পাচ্ছে বিভিন্ন বিকল্প গণিত তার পিছনেও, ঐ ব্যবসা— এবং ভবিষ্যত ব্যবহার্যতার সম্ভাবনা— আমার বিশ্বাস তা-ই।

আমার কাছে একটা দায় এসে পড়ে। 'আকাশকুসুম' রচনার অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়। গণিতের মূল ধারা আকাশকুসুমতাকে স্বীকার করেও তার আকার-বর্ণ-গন্ধের সীমানা সুনির্ধারিত করে দেয়। তাই অস্বীকার এই মূল স্রোতকে। আর রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যবসা-টেক্‌নোলজি উপযোগিতার নিক্তিতে মাপছে সব কিছু। অর্বাচীনতার সামান্য স্থান সেখানে। অস্বীকার তাকেও, সে কারণে।
বস্তুত ক্রমাগত আকাশকুসুম রচনা করে করেই এই অস্বীকারের একটা বাস্তবতাও তৈরি হবে। □

মন্তব্য : ১ □ সুদীনকুমার আচার্য

শ্রীমিহির চক্রবর্তী মহাশয়ের 'আকাশকুসুমের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটির মূল সুরটি অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধে হয় না— আমিও এই সুরে সুর মিলিয়ে নিতে চাই। কল্পনার পাখায় পাড়ি দিয়ে অনাদি-অনন্ত-অসীম মনোময় গণিতের জগতে আমরা বিচরণ করতে পারি— হারিয়ে যাওয়ারও কোনো মানা নেই। গণিত স্রষ্টা যখন তাঁর নিজের আনন্দে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সৃষ্ট গণিততত্ত্বের উপযোগিতা আছে কিনা সে প্রশ্ন তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যায়। গাণিতিক নিয়মাবলীর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতার কথা অনেকেই ভাবতে পারেন— কিন্তু যিনি স্রষ্টা তাঁর এই জাতীয় ভাবনার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই ; স্রষ্টার ভূমিকা এখানে শিল্পীর, কবির, মরমী সাধকের।

প্রবন্ধটির ইতিবাচক দিকের কথা সংক্ষেপে বলা হল। কিন্তু এই লেখাটির অন্তর্গত কিছু কিছু মন্তব্য আমার কাছে অতিসরলীকৃত বলে মনে হয়েছে। প্রবন্ধের প্রায় শুরুতেই লেখক বলেছেন "অন্যদের বিষয় নিতান্তই বাস্তব"— এ কিন্তু অভিমানের কথা, এতবড় একটা মন্তব্য লেখক কিছুটা আলগাভাবেই করে ফেলেছেন। বিশুদ্ধ গণিতের অনুশীলন এবং অধ্যয়ন বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে নিরভিমান হতে, নিস্পৃহ হতে, নিরাসক্ত হতে। পদার্থবিদ এবং রসায়নবিদ যখন মৌলিক পদার্থের অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের জটিল অবস্থান এবং ঘূর্ণনের নিয়মের কথা বলেন, যে অলৌকিক অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ভাবনা তাঁরা ভাবেন সেসবকে কি নিতান্তই বাস্তব কোনো বিষয় বলে মনে করব? এই সমস্ত প্রায়

বিলীয়মান (Infinitesimal) কণাদের স্বতঃসিদ্ধকল্প গতিপ্রকৃতি নিয়ে যখন তাঁরা জটিল অঙ্ক কষেন তখন তার বাস্তবাভিত্তি কোথায় থাকে ? এই প্রসঙ্গে স্যার জেমস্ জিনস এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (*The New Background of Science*, p-68)— 'Physical Science set out to study a world of matter and radiation, and finds that it cannot describe or picture the nature of either, even to itself. Photons, electrons and protons have become about as meaningless to the physicist as X, Y, Z to a child on its first day of learning algebra. The most we hope for at the moment is to discover ways of manipulating X, Y, Z without knowing what they are, with the result that the advance of knowledge is at present reduced to what Einstein has described as extracting one incomprehensible from another incomprehensible.'

লেখক অন্য এক জায়গায় বলেছেন— 'অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়ের অস্তিত্বের পরেই তার বর্ণনা আসে। এখানে বর্ণনা দিয়েই বিষয়ের সৃষ্টি'। বর্ণনা দিয়ে, কথার পর কথা সাজিয়ে গণিতবিদ যখন কোনো বিষয়ের সৃষ্টি করেন, তখন তার আগেই কি সেই বিষয়ের একটা ঝাপসা ছবি তাঁর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে না ? বর্ণনা তার এই মনের ছবিকে একটা বাণীরূপ দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। প্রবন্ধের একেবারে শেষে লেখকের মন্তব্য— 'বস্তুত ক্রমাগত আকাশকুসুম রচনা বার করেই এই অস্বীকারের একটা বাস্তবতাও তৈরি হবে'। এর কি কোনো প্রয়োজন আছে ? তাছাড়া কাকে অস্বীকার করার কথা উনি বলেছেন তা খুব স্পষ্ট নয়। সর্বোপরি গণিতের প্রকৃত স্বরূপের পরিপন্থী কোনো ধারাকে চেষ্টা করে অস্বীকার করা মানে, প্রকারান্তরে সেই ধারাকে স্বীকার করেই নেওয়া।

মন্তব্য : ২ □ পার্থপ্রতিম ঘোষ

অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তীর রচনাটি পড়লাম। গণিতের ছাত্র হিসাবে রচনাটি আমার কাছে শুধুমাত্র সুখপাঠ্যই হয়নি, আমার সমস্ত বিশ্বাসকে যেন প্রতিফলিত করেছে। এই প্রসঙ্গে আমি দুটি কথা বলতে চাই ; দুটিই বোধ করি এই রচনাটির মূল ভাবধারার সাথে একসুরে বাঁধা।

১) পাঠক যদি সঠিক উদ্ধৃতি দেবার অক্ষমতাকে ক্ষমা করেন তবে বলি : Bertrand Russell একবার বলেছিলেন : 'Mathematics is a science in which the scientist does not know what he says, neither is he bothered of what he says is true.'

২) গণিত ছাড়া, বোধ করি অধিকাংশ বিষয়ের ভাবগঠন পদ্ধতিকে খুব মোটা দাগে নিচের ছবিটা দিয়ে বর্ণনা করা যায় :

a-priori beliefs →	formulation of a-priori beliefs →	process of reasoning/methods of deduction →	conclusions →	a-posteriori interpretation

আমার ধারণা এই যে এই 'process of reasoning/methods of deduction' -এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে গাণিতিক পদ্ধতি। 'গণিত ছাড়া' কথাটা বললাম এই কারণে যে গণিতের বৈশিষ্ট্য হল এই এর 'a-priori beliefs' নেই এবং 'a-posteriori interpretation' নেই। তাই গণিতের জন্ম যেমন গণিতের মধ্যে, গণিতের চরম সার্থকতা লাভও গণিতেরই মধ্যে!

এবার তাহলে আমার একটি প্রশ্ন পাঠকের সামনে তুলে ধরি : গণিতের অপর নাম যদি 'আকাশকুসুম-চয়ন' হয় তবে কি সেটা একেবারে নিরর্থক হবে? □